Vol-8-No 1
1988 June

শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলীঃ লর্ড জন মেনার্ড

মোজাফফর আহমদ *

জীবন

জন মেনার্ড কেইন্স সম্ভবতঃ বিংশ শতকের সবচেয়ে প্রভাবশালী অর্থনীতিবিদ, সে প্রভাব কেবলমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অংগনে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং সে প্রভাব তার দেশে এবং বিদেশেও রাষ্ট্র পরিচালনায় অর্থনীতি নির্দ্ধারনে বিস্তৃত ছিল । অর্থনীতির ইতিহাসে লর্ড কেইন্স তাই একটি অবিস্মরনীয় ব্যক্তিত্ব, অনন্য সাধারণ প্রতিভা । রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক নীতিমালা নির্দ্ধারণেই তার প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল একথা ঠিক নয় যদিও ইউরোপ তথা বিশ্বের অর্থনৈতিক সমস্যাসংকুল মুহূর্তে তার বিশ্লেষণ ও মতবাদ অনেক ক্ষেত্রেই সংকট উত্তরণে সহায়ক হয়েছে । তার সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, উপস্থিত বুদ্ধি এবং মানবিক গুনাবলী পারিবারিক, নাগরিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাকে সুনামের অধিকারী করেছে ।

জন মেনার্ড কেইন্সের জন্ম হয়েছিল ১৮৮৩ সালের ৫ই জুন । তার বাবা জন নেভিল কেইন্স নিজেই স্বনামখ্যাত ছিলেন । লজিকে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং পলিটিক্যাল ইকনমির তত্ত্বগত দিক নিয়ে তাঁর সুলিখিত পুস্তকও রয়েছে । তিনি বহু বছর ধরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রির কাজ করেছেন । মেনার্ডের মা কেম্ব্রিজ শহরের মেয়র ছিলেন । অর্থাৎ মেনার্ড কেম্ব্রিজের বিদ্যোৎসাহী বুদ্ধিজীবি আবহাওয়ায় আশৈশব লালিত হয়েছেন । তিনি ইটনে পড়েছেন এবং সে স্কুলকে আন্তরিকভাবে ভালবেসেছেন, পরবর্তী জীবনে যখন তিনি সে স্কুল প্রশাসনের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন সেজন্য তিনি অত্যন্ত গর্বিত বোধ করেছেন । তিনি Heloise এবং Abelard সম্পর্কে নিবন্ধ লিখে কিংস কলেজে গণিত ও ক্লাসিকস পড়তে স্কলারশীপ পান । তিনি কেম্ব্রিজ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন, বার্কের রাজনৈতিক মতবাদের উপর নিবন্ধ লিখে পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং অবশেষে গণিতে দ্বাদশ র‍্যাংলার হয়েছিলেন । যদিও তিনি অন্য ট্রাইপস পরীক্ষায় বসেন নি, তবুও তিনি দর্শন ও অর্থনীতি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অধ্যয়ন করেছিলেন । সিজউইক, হোয়াইটহেড, ডবলু, ই জনসন, জি,ই, মুর এবং আলফ্রেড মার্শালের মত বিশ্বনন্দিত ব্যক্তিত্বের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং তাদের মতবাদ ও চরিত্র দিয়ে প্রভাবিত হয়েছেন ।

---

* অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯০৬ সালে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পেয়ে উত্তীর্ণ হন । সে পরীক্ষায় তিনি অন্য বিষয়ের তুলনায় অর্থনীতিতে অনেক কম নম্বর পেয়েছিলেন । এ ব্যাপারে তার একটা ক্ষোভও ছিল । শোনা যায় তিনি বলেছিলেন যে, সম্ভবতঃ পরীক্ষকেরা তাঁর চাইতেও কম অর্থনীতি জানতেন বা বুঝতেন । সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাস করে তিনি ইণ্ডিয়া অফিসে চাকুরীরত হন । সেখানে জন মরলে তার আকর্ষণ ছিল, তবে তাঁর চাইতে আকর্ষণীয় ছিল ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থা যেটি স্বর্ণমানের যুগে প্রাণবন্ত আলোচনার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছিল । সেখানে দু'বছর কাজ করেছেন এবং সে সময় তিনি তার গবেষণাকর্ম করেছেন Probability সম্পর্কে, তার এই গবেষণার ফলশ্রুতিতে তিনি কিংস কলেজের ফেলো হলেন এবং কেম্ব্রিজে ফিরে গেলেন । মেনার্ড কেম্ব্রিজে মুদ্রা সংক্রান্ত বিষয়ে পড়াতে শুরু করেন । ১৯১৩-১৪ সালে যখন ভারতীয় মুদ্রা ও অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজকীয় কমিশনের সৃষ্টি হয় তখন জন মেনার্ড কেইন্স তার কনিষ্ঠতম সদস্য হিসাবে জটিল মুদ্রাতত্ত্বের সাবলীল বিশ্লেষণ করে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করেন । তিনি ১৯১৫-১৯ সাল পর্যন্ত ট্রেজারীতে কাজ করেন, যুক্তরাষ্ট্রে ফার্স্ট লর্ড রিডিং-এর সাথে যান, প্যারীস শান্তি সম্মেলনে ট্রেজারীর প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন; এবং সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদে চান্সেলার অব এক্সচেকারের ডেপুটি হিসেবে কাজ করেন । কিন্তু তিনি তা পদত্যাগ করে আবার কিংস কলেজে ফিরে আসেন এবং তার বার্সার হন । কেম্ব্রিজে ফিরে এসেও নীতি-নির্ধারণের যে জ্ঞান তিনি আহরণ করেছিলেন তারই আকর্ষণে তিনি লণ্ডনে বেশ সময় কাটাতেন । তিনি অর্থ ও শিল্প সম্পর্কিত ম্যাকমিলন কমিটির সদস্য ছিলেন এবং তার সমাদৃত রিপোর্টের অনেকখানি রচনাও করেছিলেন ।

১৯৪০ সালে তিনি চান্সেলার অব এক্সচেকারের পরামর্শদাতা পরিষদের সদস্য হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন । তিনি ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের একজন ডিরেক্টরও ছিলেন । ১৯৪২ সালে তাকে লর্ড অব টিলটন খেতাবে ভূষিত করা হলে তিনি পার্লামেন্টের হাউজ অব লর্ডসের আলোচনায় প্রাণবন্ত ও যৌক্তিক মতবাদের উপস্থাপনা করেছেন । ১৯৪৩ সালে তাকে কেম্ব্রিজ (বরোর)-এর হাই ষ্টুয়ার্ড নিয়োগ করা হয় । তিনি ন্যাশনাল গ্যালারী অব আর্টসের ট্রাষ্টি ছিলেন বহুদিন ধরে । এ ছাড়াও সংগীত ও কলা উন্নয়নের জন্য যে কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল তিনি ছিলেন তার সভাপতি । তার স্ত্রী লিডিয়া লোপোকোভা এক সময় রুশ রাজকীয় ব্যালের নর্তকী ছিলেন । ১৯২৫ সালে তাদের বিয়ে হয়, লিডিয়া তার জন্য সুস্থ সুন্দর ও যত্নশীল গৃহের রচনা করে তার কাজের যে সহায়তা করেছেন সেটি স্মরণ করেই মিসেস আলফ্রেড মার্শাল এক সময় বলেছিলেন মেনার্ডের জন্য লিডিয়ার সাথে বিবাহই ছিল সর্বোত্তম কর্ম ।

জন মেনার্ড কেইন্স তার বিস্তৃত ও ব্যস্ত জীবনে অর্থনীতি সম্পর্কে মৌলিকতত্ত্ব ও বিশ্লেষণ দিয়ে গেছেন । তার অর্থনীতির একটি আকর্ষণীয় দিক ছিল তত্ত্বের ও বিশ্লেষণের প্রাসংগিকতা । কিন্তু অর্থনীতিতে বিপ্লবাত্মক অবদান ছাড়াও অনেকে তার ইংরেজী লেখাকে উঁচু পর্যায়ের সাহিত্য বলে বর্ণনা করেছেন । । অনেকেই তার ভার্সাই শান্তি আলোচনাকে নিয়ে লেখা Eassys in Biography-কে জ্ঞান ও রসবোধের এক অনন্য উপস্থাপনা বলে মনে করেন ।

তিনি অর্থ ব্যবস্থাপক হিসাবেও খ্যাতি কুড়িয়েছেন । তিনি দীর্ঘদিন কিংস কলেজের বার্সার ছিলেন । ঐ কলেজের অর্থ ব্যবস্থাপনায় তিনি যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তার ফলে কিংস কলেজের আর্থিক সম্পদ বহুগুণ বেড়ে যায় । তিনি পত্রিকার সম্পাদক হিসাবেও অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন । ১৯১১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি যুক্তরাজ্য তথা বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর অর্থনীতি বিষয়ক পত্রিকা Economic Journal-এর সম্পাদক ছিলেন । তিনি Nation ও New Statesman পত্রিকাতে ও ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের জন্য অনবরত লিখেছেন । তিনি নেশন ও পরে নিউ ষ্টেটসম্যান পত্রিকার চেয়ারম্যান ছিলেন; তার সম্পাদকীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং সে কারণে পত্রিকা দু'টিকে তার মতামতের বাহন হিসাবে ব্যবহার না করতে সতর্ক ছিলেন । ১৯২১ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত একটি বীমা কোম্পানীর চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেছেন, এ ছাড়াও চালিয়েছেন একটি বিনিয়োগকারী কোম্পানী । তিনি একটি ব্যালে কোম্পানী সংগঠন করেন এবং কেম্ব্রিজে আর্টস থিয়েটারের উদ্বোধন করে এর প্রাথমিক স্তরে অর্থের যোগান দেন । কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অর্থনীতি বিভাগ গড়ে উঠে সে কাজে তার অবদান কম ছিল না । ছাত্রদের নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনায় তার গভীর আগ্রহ ছিল ।

তার মত প্রভাবশালী অর্থনীতিবিদ ইংরেজী ভাষা প্রভাবিত দুনিয়ায় সম্ভবতঃ এডাম স্মিথ ছাড়া আর কেউ নেই । প্রাথমিকভাবে তার যে বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা ছিল তা হল মুদ্রা ব্যবস্থা (বৈদেশিক মুদ্রাসহ)। এ সময়ে তার সৃজনধর্মী লেখা হল Indian Currency and Finance. কিন্তু ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের পরে তিনি অর্থসংকোচন ও ব্যবসায় মন্দা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন এবং তার ফলশ্রুতিতে শ্রমবিনিয়োগে ও উৎপাদন কর্মের উপর বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত হয়, এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, উৎপাদন সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থাকে সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং সরকারকে কখনও কখনও সচেতনভাবে পুঁজি বিনিয়োগ ও পুঁজি সৃষ্টি করতে হবে । এই সিদ্ধান্তগুলো অর্থনৈতিক পদ্ধতির একটি সামগ্রিক অথচ নাজুক বিশ্লেষণের ফলশ্রুতি । অর্ধশতাব্দি পরেও অর্থনীতিবিদেরা কেইন্সীয় বিশ্লেষণের বিন্যাস ও পদ্ধতির যৌক্তিকতা, পুনঃর্বিবেচনা, সম্প্রসারণ নিয়ে অনেক সময়ই ব্যাপৃত থাকেন ।

অনেকে তার লেখায় অসংলগ্নতার অভিযোগ করেছেন । তার মতবাদের পরিবর্তন হয়েছে এবং তার চিন্তার বিবর্তন ঘটেছে এই অর্থে যে, তিনি তার তত্ত্বের বৃহত্তর সমন্বয় সন্ধান করেছেন । তার পুরোনো ধারনাকে বিশ্লেষণ করেই নতুন ধারণার জন্ম হয়েছে এবং তার তত্ত্বের বিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে অনুসরণযোগ্যতা তিনি বৃদ্ধি করতে প্রয়াসী হয়েছেন । এ যেন সযত্নে লালিত তারুণ্যকে চিরায়ত করবার চেষ্টা ।

তার Treatise on Probability দর্শনের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ । যদিও বইটিতে অংকের সংকেত চিহ্ন বহুল ব্যবহৃত হয়েছে তবুও Probability-র অংক নয় বরং তার দার্শনিক ভিত্তিই তাকে আকৃষ্ট করেছে । বইটিতে তার জ্ঞান, পাঠ ও পাণ্ডিত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ।

কেইন্স ইতিহাসের ধারায় তার প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন । প্যারীস শান্তি মিশনের আলোচনা থেকে পদত্যাগ করে তিনি শান্তি চুক্তি সম্পর্কে বিশ্ব মতকে প্রভাবিত করেছিলেন, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে তার মত গ্রহণীয় না হয়েও তার যুক্তি সমাদৃত হয়েছে । ১৯২৫ সালে অনেক দেশ স্বর্ণমানে ফিরে গেলেও এসম্পর্কে কেইন্সের মত ইতিহাস যথার্থ বলে চিহ্নিত করেছে । ১৯২৯ সালে তিনি বেকারত্বকে প্রথম সমস্যা বলে নির্দিষ্ট করে রাজনৈতিক মত সংগঠন করতে সমর্থ হন ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মেনার্ড কেইন্স ট্রেজারীর সাথে যুক্ত ছিলেন । ১৯৪৩ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধাবস্থার পরে পূর্ব যুদ্ধের ভুলভ্রান্তি এড়িয়ে নতুন পৃথিবী সংগঠনের জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ার বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা চালিয়েছেন । সংগততাবেই বৃটিশ পরিকল্পনার পরিচিতি তার নামানুসারেই হয়েছিল । ১৯৪৪ সালে ব্রেটন উডস যেখানে একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় সেখানেও কেইন্স সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন । ১৯৪৫ সালে মার্কিন ঋণ চুক্তির ব্যাপারে তিনমাস ধরে দীর্ঘ আলোচনাও তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও যুক্তি সহকারে চালিয়েছেন । হাউজ অব লর্ডস-এ এ চুক্তিকে তিনি যুক্তির সাথে সমর্থন করেছেন । আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্ব ব্যাংকের বোর্ড অব গভর্নরস-এর মিটিং শেষ করে লণ্ডনে ফেরার দু'সপ্তাহের মধ্যেই ২১শে এপ্রিল ১৯৪৬ এ কেইন্স হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন ।

কেইন্সীয় চিন্তাধারার ঐতিহাসিক পটভূমি

১৯২০ ও ৩০-এর দশকে ইউরোপীয় সমাজে অনেক পরিবর্তন এসেছিল । কেইন্সের দীর্ঘ জীবনে তিনি অনেক পরিবর্তন দেখেছেন । ইটন অফিসার ট্রেনিং দলের সদস্য হিসেবে তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দেন । আর মৃত্যুর পূর্বে তিনি বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন । তার অনেকের মতই আশা ছিল যে, এর ফলে শান্তি এবং সমৃদ্ধির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে ।

কেইন্সের কেম্ব্রিজ ও তার ব্লুমসবেরী বন্ধুবর্গ ভিক্টোরিয়ান ইংল্যাণ্ডের মধ্যবিত্তের মূল্যবোধকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছিল । প্রথম মহাযুদ্ধের পরে সে নৈতিকতা ও রীতিনীতি সম্পর্কে সপ্রশ্নবোধ প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠে । Economic Consequence of the Peace বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কেইন্স মধ্যবিত্তের স্বচ্ছল জীবনের একটি ছবি তুলে ধরেছেন । খুব কম লোকই বুঝতে পেরেছিল যে, প্রথম মহাযুদ্ধ এক অস্বাভাবিক, অস্থিতিশীল, জটিল, অনির্ভরশীল ও ক্ষণিক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যা থেকে পিছনে প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয় । সমস্ত দেশ সম্পদহীনতায় ভুগছিল, দুর্ভিক্ষাবস্থায় পতিত হয়েছিল, বেকারত্ব বেড়েছিল, শ্রমিকের মনোবল ভেংগে গিয়েছিল । মূল্যস্ফীতি আয়কে নিঃশেষ করে দিয়েছিল এবং সে সাথে ব্যবসায়ী ও পেশাদার শ্রেণীর মূলধন নিঃশেষিত হয়ে পড়েছিল । কেইন্স এ সময় জার্মানীতে মূল্যস্ফীতি প্রত্যক্ষভাবে দেখেছিলেন আর সেখানে এটাও লক্ষ্য করেছিলেন যে মুদ্রার মানের অস্থিতি

জনসাধারণের বিশ্বাসকে বিধ্বস্ত করে দেয় । তার লেখায় কেইন্স বিশ্লেষণ করে তুলে ধরেছেন যে, মূল্যস্ফীতি কি করে অবিবেচকভাবে কিছু লোকের ধন আত্মসাৎ করে আর অন্যদিকে আরেক দলকে অভাবনীয় মুনাফা এনে দেয় ।

১৯১৯ সালে কেইন্স চেয়েছিলেন ইউরোপীয় সমাজের পুনর্গঠনকে সম্ভব করে তুলতে । মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে ইউরোপের পুনর্গঠন সম্পর্কে কেইন্সের নিজের লেখায় তিনি মূল্যস্ফীতি, মুদ্রাসংকোচন ও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে যে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন সেগুলোই পরবর্তীতে A Tract on Monetary Reform হিসেবে প্রকাশিত হয় । এ প্রবন্ধাবলীতে কেইন্স রক্ষণশীল মতবাদ ব্যক্ত করেছেন এবং মুদ্রার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চেয়েছেন । এ সময় তিনি ইংল্যাণ্ডকেও ইউরোপের অবিচ্ছেদ্য অংগ বলে ভেবেছেন । কিন্তু ১৯২০ সালে লিবারাল পার্টির শিল্প সম্পর্কে সমীক্ষায় অংশ গ্রহণ করার পর তার এই ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গী হারিয়ে যায় এবং তিনি অনেক বেশী বৃটিশ সচেতনতা প্রকাশ করেন । তাৎক্ষণিক সমস্যা ছিল বেকারত্ব যার সমাধান কেইন্স তার লেখায় খুঁজেছিলেন এবং তারই ফলশ্রুতিতে General Theory লেখা হয়েছে । কেইন্স বেকারত্বের সাথে সম্পদের অসম এবং স্বেচ্ছাচারী বন্টনকেও জাতীয় সমস্যা বলে গণ্য করেছেন ।

১৯২০ সালে কেইন্সের লেখা কিছু প্রবন্ধে তার চিন্তাধারার পরিচয় মেলে । তিনি মনে করতেন আর্থ-সামাজিক সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক সম্ভাবনা সে সময়ে বিরাজ করছিল । The End of Laissez Faire প্রবন্ধে তিনি বেন্থামের দর্শন যে ব্যক্তি স্বার্থ জনস্বার্থের পরিপন্থি নয় বরং ও দু'টির একমুখী প্রবণতা রয়েছে তার সমালোচনা করেন । কেইন্স তার প্রবন্ধে লিখেছিলেন লম্বা গলার জিরাফগুলোই উঁচু ডালের কচিপাতা ভোগ করে আর ছোট গলার জন্তুরা ঝরে যাওয়া পায়ে দলা পাতার উপর নির্ভর করে ।

কেইন্স চেয়েছিলেন এমন এক সমাজ যেটি অর্থনীতিগতভাবে দক্ষ এবং সামাজিক অর্থে ন্যায় সম্মত । এদিক থেকে তিনি সরকারীভাবে সে উদ্যোগ গ্রহণের পক্ষপাতি ছিলেন যেগুলো বেসরকারী বা আধাসরকারীভাবে করা হয় না বা করা যায় না । তবে সরকারের জন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সজ্ঞান ব্যবস্থাপনাকে তিনি প্রাথমিক কাজ বলে গণ্য করেছেন । তিনি ব্যবসাকে নিরুৎসাহিত করতে চান নি এবং ব্যবসায়ীর মুনাফাকে ছোট করতে চান নি কিন্তু শ্রমজীবীর জন্য তিনি সরকারী খরচে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, বিনোদন ও পেনশন চেয়েছেন যার মূল অর্থ ব্যবসায়ের উপরে কর থেকে আসবে । এসবের কারণে অনেকে তাকে সমাজতন্ত্রী বলে ভেবেছেন । কিন্তু তিনি নিজেকে বামপন্থী উদারনৈতিক বলে ভাবতেই পছন্দ করতেন ।

১৯৩০-এর দিকে ইউরোপে অর্থনৈতিক কারণে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয় । সে সময় ইউরোপীয় দেশসমূহ অন্তর্মুখী হয়ে পড়েছিল নিজেদের সমস্যা সমাধানের তাগিদে । আর স্বৈরাচারী দেশসমূহ Regimentation-এর আশ্রয় নিয়েছিল । এসময় কেইন্সের চিন্তাধারায় জাতীয় আত্মনির্ভরশীলতার ধারা ছায়াপাত করে । তিনি রাষ্ট্রীয় অর্থ যোগান ও দেশে উৎপাদনের স্বার্থে শুল্ক বসানোর পক্ষে মতামত দেন । কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সবচেয়ে মূল্যবান মনে করেছেন এবং এক অর্থে The General Theory এবং How to Pay for the War স্বৈরাচার বিরোধী মনোবৃত্তিরই প্রকাশ।

১৯২০ সালে কেইন্স বিলেতের লিবারাল পার্টির রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন । তিনি তাদের পক্ষে বক্তৃতা করেছেন, Nation পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন এবং নির্বাচনী দলীলে সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে বেকারত্ব লাঘবের ঘোষণা দিয়েছেন । ১৯২৮ সালে এক বক্তৃতায় মূল্যস্তর সম্পর্কে আলোচনায় তিনি মুদ্রা ও ঋণ নীতি সম্পর্কে দেশে যা ঘটছে তার নিরিখে নতুন আলোচনার আহ্বান জানান । এসময় তিনি Treatise on Money নিয়ে কাজ করছিলেন । যদিও তিনি রাজনীতি নিয়ে তখন আলোচনায় মেতে ছিলেন, তবুও সর্বক্ষণ অর্থনীতিই তার লক্ষ্য ছিল ।

তিনি সরকারের বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের একটা ভূমিকা অনুধাবন করেছিলেন । ১৯২৯ সালে শ্রমিক সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের অধীনে Economic General Staff সৃষ্টির সুপারিশ করে তিনি বলেছিলেন যে, সরকারী কর্ম সম্পর্কে ধারণার বিবর্তন হওয়া প্রয়োজন এবং সরকারকে অর্থনৈতিক জীবনধারার পথ প্রদর্শক ও সে পথে উত্তরণে সহায়ক হতে হবে । কিন্তু তিনি নিজেকে কখনই পেশাদারী দক্ষতা আর রাজনৈতিক দায়িত্বশীল অবস্থার চাপে পড়তে চাননি । তিনি শিক্ষাঙ্গনে অবস্থিত ক্ষুদ্র পরিসরে অর্থনীতি বিজ্ঞানে আত্ম নিবেদিত হয়ে থাকতে চান নি । তার মানসিকতা ছিল কর্মমুখী এবং বৃহত্তর অর্থে সমাজ সচেতন ব্যক্তি হিসাবে অর্থনীতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নীতিমাধ্যম নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে চেয়েছেন'। এজন্য তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল মার্শালের অর্থনীতি পাঠ এবং সমষ্টিগত অর্থনীতির তত্ত্বগত আলোচনা তার পুরোপুরি জানা ছিলনা । তবুও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছাত্র-সহকর্মীর সাথে দীর্ঘ আলোচনা এবং স্বতঃস্ফূর্তজ্ঞান এক্ষেত্রে তার কাজের ভিত্তি রচনা করেছিল । আজীবন বাধা-বন্ধনহীন দার্শনিক আলোচনা, তার সুস্থ স্থিত স্বচ্ছল পারিবারিক জীবনধারা, অনুশীলনমুখী বিদ্যাভ্যাসে ও ক্ষমতাসীন লোকের সাথে জানাশোনা তাকে এক আত্মবিশ্বাসপূর্ণ মানসিকতা দিয়েছিল যেখানে অসম্ভবের সীমানা ছিল অপরিচিত । এবং তার অনন্যসাধারণ ক্রিয়াকর্ম তাকে এমনভাবে বহুল পরিচিত করে রেখেছিল যে তার নীতি নির্দ্ধারণী লেখা ও প্রচারণার দিকে সরকারকে কর্ণপাত করতে হত । সে কারণে ১৯২৯ সালে যখন তিনি সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে বেকারত্ব কমাবার কথা বলেছেন তখন লিবারাল সরকারকে দীর্ঘ শ্বেতপত্র ছাপিয়ে এ প্রস্তাবের সম্ভব্যতা সম্পর্কে সন্দেহ ব্যক্ত করতে হয়েছে ।

মেনার্ড কেইন্সের মানসিকতায় সমাজের ভাগ্যহতদের জন্য একটি তীব্র দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায় যার মূল হল খৃস্টিয় নৈতিকতা ও বিত্তবানের সমাজ চেতনায় । মেনার্ড কেইন্সের একটি অবিশ্বাস্য ক্ষমতা ছিল, তিনি অল্প সময়ে যে কোন বিষয়ে একটি কর্মপন্থা দাঁড় করাতে পারতেন এবং তিনি বিশ্বাস করতে ও করাতে পারতেন যে ঐ কর্মপন্থা অনুসরণ করলে অনেক আর্থ-সামাজিক সমস্যার তাৎক্ষণিক সহজ সমাধান সম্ভব হবে ।

মেনার্ড কেইন্সের দু'জন শিক্ষক তার সমাজ দর্শনকে প্রভাবিত করেছিলেন । একজন হলেন আলফ্রেড মার্শাল যিনি ছিলেন তার শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান গুরু, আর একজন হলেন মার্শালের প্রধানতম শিষ্য এ.সি. পিগু যিনি মার্শালের সমাজ দর্শনকে প্রকাশ করেছিলেন

তার The Economics of Welfare বইতে । এ দু'জনের দার্শনিক ও মতাদর্শগত প্রভাব কেইন্সের জীবনে সর্বদা বিদ্যামান ছিল । কেইন্সের General Theory-তে যে সামাজিক দর্শন মাঝেমাঝেই ফুটে উঠেছে সেটা প্রধানতঃ মার্শাল-পিগুর সমাজ দর্শন । যদিও প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ভিক্টোরীয় সমাজ ব্যবস্থা মুদ্রাব্যবস্থার অস্থিতির মধ্যে ভেংগে পড়ে এবং আয়বৈষম্য বিদূরণের চাইতে বেকারত্ব অধিক গুরুতর সমস্যা হয়ে দেখা দেয় এবং কেইন্স মূলতঃ আয় সৃষ্টি ও শ্রমনিয়োগকে প্রাধান্য দিয়েছেন তবুও তার লেখায় সুষম সমাজ, বিত্তবানের সামাজিক দায়িত্ববোধ যেটা সরকারের দায়িত্ববোধে বিস্তৃত হয়েছে এবং নৈতিকতার ধারণা সর্বত্র বিধৃত ।

মেনার্ড কেইন্স তার লেখায় আলফ্রেড মার্শাল দিয়েই প্রভাবিত হয়েছিলেন । মার্শাল অবশ্য তার লেখা মূলতঃ মাইক্রোইকনমিকস এর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন এবং সেখানেও তিনি আংশিক ভারসাম্য সম্পর্কেই বিস্তৃত আলোচনা করেছেন । এব্যাপারে মার্শালের কৃতিত্ব অত্যন্ত ব্যাপক, যদিও সেখানে কিছু কিছু ফাঁক থেকে গিয়েছিল যেগুলো পরে পিগু, জোন রবিনশন ও এডওয়ার্ড চেম্বারলিন শুধরাবার চেষ্টা করেছেন । কিন্তু মাইক্রোইকনমিকসের দৃষ্টিকোণ থেকে মার্শালের আংশিক ভারসাম্যের সবচেয়ে বড় বিষয় হল ক্যাপিটাল থিওরির মূল বিষয় নিয়ে আলোচনার অনুপস্থিতি এবং প্রয়োজনীয় সাধারণ ভারসাম্যের বিষয়ে অনুচ্চারণ। তবুও কেইন্স তার আলোচনায় মার্শাল নির্দেশিত বিশ্লেষণ অনুসরণ করেছেন, তার চাহিদা ও সরবরাহের অনুশীলনকে ব্যবহার করেছেন, অবিমিশ্র মূল্য নির্দ্ধারণে প্রতিযোগীতাকে নাতিদ্বিধায় গ্রহণ করেছেন । তেমনিভাবে শ্রমবিনিমোগের সাথে তাদের প্রকৃত প্রান্তিক উৎপাদন কমে যাওয়ার মার্শেলীয়তত্বও তিনি ব্যবহার করেছেন । অর্থাৎ মার্শালের অর্থনীতি থেকে মুক্ত হতে পারেন নি এবং মার্শালের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের কাঠামোকে আংশিক ভারসাম্যের বাইরে সমষ্টিগত ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন । অবশ্য মার্শেলীয় অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পদ্ধতি কেইন্স অবলম্বন করেছেন সেটি হল মজুরীকে তিনি পরিমাপের একক হিসাবে ব্যবহার করেছেন । ফলে মুদ্রার পরিমাপে মূল্য প্রকৃত মূল্যের সমান হয়ে পড়েছে আর সে কারণে মার্শালের মাইক্রোইকনমিকসের অনেকটাই কেইন্সের মাইক্রোকনমিকসে ব্যবহার সম্ভব হয়েছে । ফলে কেইন্সকে অনেক মৌলিক বিষয় উপেক্ষা করতে হয়েছে । মাইক্রোইকনমিকসের একটি অনুমান হল প্রাথমিক স্তরে মুদ্রাঘটিত পরিবর্তনকে উপেক্ষা করে চলা । উনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধে বা প্রথম মহাযুদ্ধের আগে এরকম একটা অনুমান অসংগত ছিল না তখন ব্যবসাচক্র ছোট এবং তীব্র ছিল, এটা মূলতঃ ব্যবসা বাণিজ্যকে ব্যাহত করত । এবং শিল্পোৎপাদনকেও শ্রমবিনিয়োগকে তেমন প্রভাবিত করত না । কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এটা আর সত্য ছিল না ।

মার্শাল মুদ্রা বিষয়ে কোন বই লেখেননি, যদিও তিনি তার Principles of Economic-এর মতই আরেকটি বই লিখবেন বলে পরিকল্পনা করেছিলেন । সেকারণে Quantity Theory of Money-এর একটি কেম্ব্রিজ ভাষ্য রেখে গেছেন যেখানে মুদ্রাকে এক জাতীয় সম্পদ হিসাবে গণ্য করে Marginal Utility তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়েছে । কেইন্স পরবর্তী পর্যায়ে Treatise ও General Theory-তে এই বিচিন্তাকে মুদ্রার চাহিদা তত্ত্বের নতনুরূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন ।

কেইন্সীয় চিন্তাধারার বিবর্তন

মেনার্ড কেইন্স অংকশাস্ত্রে দক্ষ হয়েও, এমনকি প্রাথমিক জীবনে Probability তত্ত্বের উপর সন্দর্ভ লিখেও গণিত নির্ভর অর্থনীতি বিষয়ে কাজ করেন নি । তার সারা জীবনের কাজ রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক প্রশ্ন নিয়েই ব্যাপৃত । তবুও তিনি রাজনীতি করেন নি, যদিও রাজনীতির অংগনে তিনি অপরিচিত ছিলেন না এবং সকল রাজনীতিকের ক্ষমতার সন্ধান ও অজানা ছিল না । কেইন্স ছিলেন একনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী যিনি মুক্ত বুদ্ধির সাহায্যে সমস্যা বিশ্লেষণ করে তার মতামত ব্যক্ত করতে ভালবাসতেন; কোন দল, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি তার প্রশ্নহীন আনুগত্য ছিল না । অনেকে মনে করতেন যে, এরকম মানসিকতা নিয়ে তিনি হয়তবা সিভিল সার্ভিসে সুনাম করতে পারতেন । কিন্তু রুটিন মাফিক বাধা ধরা কাজে তার ছিল অসহনীয় বিতরাগ, আর দাপ্তরিক অর্থহীন স্তরবিন্যাস ও নিয়মাবলীতে তিনি ছিলেন বিতশ্রদ্ধ । সেকারণেই বুদ্ধির সীমাহীন প্রকাশের সুযোগ যে কর্মে তিনি তার সমস্ত কিছুতেই নিজেকে ব্যাপৃত করেছিলেন — অধ্যাপনা, বিতর্ক, লেখা, সম্পাদনা ও পরামর্শদান ।

মেনার্ড কেইন্স ১৯৩৬ সালে তার General Theory লিখে তার মুখবন্ধে বলেছেন যে, তার চিন্তার স্বাভাবিক বিবর্তনের মাঝে General Theory-র উদ্ভব । স্মরতব্য যে, তার প্রথম বই ছিল ভারতীয় মুদ্রা ও অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে সেখানেও কি General Theory-র বিচিন্তা লক্ষ্য করা যায় ? সে সম্পর্কে আপাততঃ কিছু না বলেও বিনা দ্বিধায় একথা বলা চলে ইংরেজী ভাষায় স্বর্ণমান সম্পর্কে যে সমস্ত লেখা রয়েছে মেনার্ড কেইন্সের প্রথম বইটি তার মধ্যে সবচেয়ে সুলিখিত । শুধু তাই নয় পরবর্তীকালে Treatise on Money-তে যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে তার কিছু কিছু মেনার্ড কেইন্সর প্রথম বইটিতে লক্ষণীয় এবং General Theory-তারই পরবর্তী অনুশীলন । একথা বলা চলে এজন্য যে কেবল মুদ্রা ব্যবস্থার বিষয় নিয়ে স্বল্প পরিচিত পরিসরে মেনার্ড কেইন্স ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থার আলোচনা করেন নি । তার সজ্ঞানতা ছিল আরও বিস্তৃত । তিনি সমস্যার রূপ, সম্ভাব্যতা ও সম্ভাবনা অনুধাবন করেছেন । তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, মুদ্রা ব্যবস্থার প্রভাব কেবল মূল্যস্তরের উপরে পরে তা নয় বরং আমদানী, রপ্তানী, উৎপাদনেও শ্রমনিয়োগের উপর তার প্রভাব ক্রিয়াশীল । লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকসে ১৯১০-১১ সালে ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থার উপরে বক্তৃতা দিতে গিয়ে এ সমস্তই তিনি তুলে ধরেছিলেন । এই অনুধাবনই তিনি প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ব্রটেনের অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করেই তত্ত্বীয় যে উত্তরণ ঘটান তারই শেষ ফলশ্রুতি হল General Theory.

এর মাঝে তিনি অবশ্য The Economic Consequence of Peace (১৯১৯) লিখেছেন । বইটি অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে । এই অসাধারণ সাফল্যের মূলে ছিল অসাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞান, শানিত যুক্তি, আন্তরিক মানবিক আবেদন, তথ্যের বাস্তব উপস্থাপন এবং সুস্থির বিশ্লেষণ। আর ছিল প্রাঞ্জল ভাষার কারিগরী । এই বই-এর পরেই তিনি লিখেছেন A Revision of the Treaty (১৯২২) । বই দু'টিতে তিনি তাত্ত্বিক উপস্থাপনা পরিহার করেছেন । এসময়ে তার আর্থ-সামাজিক উপলব্ধিকে তিনি ব্যক্ত করেছেন এভাবেঃ Laissez Faire ধনতন্ত্রের অসাধারণ যুগের অবসান হয়েছে ১৯১৪

সালের আগষ্ট মাসে। সে সময়ের অবসান হয়েছে যখন ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের উদ্যোগী কর্মকাণ্ডে একের পর এক সাফল্য অর্জন করেছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিনিয়োগের অপরিমেয় সুযোগ, উৎপাদন কৌশল উন্নয়ন এবং অন্যদেশ থেকে আনা সস্তা কাঁচামাল ও খাদ্যের কারণে। সে অবস্থায় বিত্তবানের উদ্বৃত্ত বিনিয়োগের সমস্যা ছিল না। কিন্তু মেনার্ড কেইন্স লক্ষ্য করলেন যে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে সে অবস্থার গুণগত পরিবর্তন হয়েছে।

বিনিয়োগের সুযোগ কমে আসছে এবং বিত্তবানের সঞ্চয় তার সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক না হয়ে অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানেই অর্থনৈতিক স্থবিরতা সম্পর্কে নতুন তত্ত্ব পাওয়া যায় যেটি রিকার্ডোর মতামত থেকে ভিন্ন এবং যেটি পরে General Theory-তে পূর্ণতা লাভ করেছে। অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রতিটি পূর্ণ তত্ত্বের দু'টি দিক থাকে একটি হল সমাজ ও সামাজিক অবস্থার নিরক্ষীত জ্ঞান অর্থাৎ এক সময় কোন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ আর কোন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয়। অন্যটি হল বিশ্লেষণের শৈলী যার মাধ্যমে তার বোধিকে সংগঠিত করা যায় এবং তত্ত্ব সৃষ্টি হয়। Economic Consequence of Peace-এ তত্ত্ব নেই, আছে সমাজদৃষ্টি। আর General Theory হল সে সমাজদৃষ্টির রূপান্তরিত তাত্ত্বিক রূপ।

যারা অর্থনীতির "বৈজ্ঞানিক" রূপে আকৃষ্ট তাদের কাছে General Theory-র লেখক মেনার্ড কিইন্স অনেক বেশী আকর্ষণীয়। কিন্তু Economic Consequence of Peace থেকে General Theory-র দিকে এই যে অগ্রগমন, যদিও এটা অনেকাংশে সরলরৈখিক, তবু তার উত্তরণ আছে বিভিন্ন পর্যায়ে। তারই একটি পর্যায় হল A Tract on Monetary Reform (১৯২৩)। কেইন্স চেয়েছিলেন বাস্তবতার নিরিখে সম্ভাব্য নীতির নির্দেশনা দিতে। তিনি প্রথমতঃ অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরকে স্থিতিশীল করে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ তথা অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে চেয়েছিলেন। এবং এরই সাথে বৈদেশিক মুদ্রা মূল্যে অস্থিতির দরুন অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে যে সাময়িক অস্থিরতা দেখা যায় সেটা বিদূরণ করতে চেয়েছিলেন। এই দুই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য তিনি মুদ্রা সৃষ্টিকে (Note Issue) কেন্দ্রিয় ব্যাংকের স্বর্ণ সঞ্চয় থেকে বিযুক্ত করে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন, যদিও স্বর্ণ সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। লক্ষ্যণীয় যে, মেনার্ড কেইন্সের বিশ্লেষণ ও উপদেশ বৃটিশ অবস্থার বিশেষ প্রেক্ষিতে করা হয়েছিল। এটি তার স্বদেশ প্রেম, রক্ষণশীলতা ও নিঃসঙ্গতা থেকে এসেছিল। এবং সে কারণে তিনি অন্য দেশের দৃষ্টি ভংগি, অবস্থা, স্বার্থ এবং বিশ্বাস অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন। এখানে এটাও স্মর্তব্য তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না, শ্রেণী নির্দিষ্ট মতবাদেও নাম লেখান নি, তিনি ছিলেন মহাযুদ্ধের পূর্বে বৃটিশ মুক্তবুদ্ধির প্রতীক যাদের আদর্শ ছিল লক এবং মিল।

ইংল্যাণ্ড নেপলিয়ানের সাথে যুদ্ধ জয় করে যে অবস্থায় ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পরে সে অবস্থায় ছিল না। তার সম্পদ ক্ষয় হয়েছিল, অনেক সুযোগ নষ্ট হয়েছিল, তার সামাজিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং সর্বক্ষেত্রে অনমনীয়তা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তার কর ও মজুরীর হার দ্রুত উন্নয়নের পরিপন্থি হয়ে পড়েছিল, কিন্তু সেগুলো পরিবর্তন রাজনৈতিকভাবে সম্ভব ছিল না। কেইন্স যা সম্ভব নয়, তা নিয়ে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন

না। তিনি একক সমস্যা সমাধানের দিকে— যেমন কয়লা, বস্ত্র, লোহা, জাহাজ নির্মাণ— মনোযোগ না দিয়ে, সামগ্রিক অর্থনীতিকে নিরিখ করতে চেয়েছেন। যা সম্ভব এবং যা সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য কার্যকর — সেই মুদ্রাব্যবস্থাপনা— তার মনযোগ আকর্ষণ করে। তিনি জানতেন ব্রটেন যুদ্ধপূর্ব স্বর্ণমানে ফিরে যেতে পারে না। এবং মুদ্রাব্যবস্থাপনা কিছু অসুবিধা ও সমস্যাকে অন্ততঃ সহজতর করে তুলতে পারে। কেইন্স যেহেতু ব্রটিশ অবস্থার প্রেক্ষিতে তার নীতিমালা ও বিশ্লেষণের অগ্রগমন ঘটিয়েছেন, সে জন্য এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কেইন্সীয় অর্থনীতি অন্যত্র স্থাপন করতে গেলে পরিবেশের পরিপূর্ণ বিচার বিশ্লেষন প্রয়োজন। Tract of Mometary Reform-এ নতুন কিছু ছিলনা, ছিল উপস্থাপনার প্রাসংগিকতা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সামগ্রিক সমস্যার সমাধানে মুদ্রা ব্যবস্থাপনার ব্যবহার। আর ছিল মুখবন্ধ ও প্রথম অধ্যায়ে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে তার উদ্বেগ যা ছিল Economic Consequence of Peace-এ তার উপস্থাপনার চাইতে আরও একটু সুসংবদ্ধ।

কেইন্স বিশ্লেষণের জন্য Quantity Theory of Money-কে মূলসূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এখানে অবশ্য বিনিময় সমীকরণ (Equation of Exchange) এবং মুদ্রার সংখ্যা তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য কেইন্স অনুধাবন করতে পারেন নি। যেটি কেইন্স গ্রহণ করতে চেয়েছেন তা হল কেম্ব্রিজ ভাষোর বিনিময় সমীকরণ, যেটি identity বা তারসাম্যের শর্ত হিসেবে যা নির্দেশ করে তার সাথে মুদ্রার সংখ্যাতত্ত্বের প্রতিজ্ঞাগুলোর মিল নেই। সে কারণেই মেনার্ড কেইন্স মুদ্রার ভেলসিটিকে মুদ্রা ব্যবস্থাপনার একটি পরিবর্তনীয় রূপ হিসাবে গণ্য করেছেন। এবং এখানেই General Theory-র Liquidity Preferance তত্ত্বের প্রাথমিক বিকাশ লক্ষ্যণীয়। তার বইটিতে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দিক ও রয়েছে। তিনি বিনিময়ের আগাম বাজার সম্পর্কে অত্যন্ত বিশ্লেষণধর্মী ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তিনি গ্রেট ব্রটেনের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও আকর্ষণীয় আলোচনা করেছেন।

কেইন্সের চিন্তাধারার উত্তরণের দ্বিতীয় পর্যায় হল Treatise on Money, এমন উদ্দীপক বই কেইন্স সম্ভবতঃ দ্বিতীয়টি লেখেন নি। এ বইতে তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চিন্তা ধারার প্রাককথনও রেখেছেন ত্রয়োদশী হিসেবে। দু'খণ্ডে সমাপ্ত এ বইটি কেইন্সের উচ্চাভিলাসী কর্ম এবং এখানেই কেইন্সের প্রকৃত গবেষণার পরিচয় রয়েছে। অনেক অর্থনীতিবিদের মতে কেইন্স যদি মার্শালের মত লেখায় চরমোৎকর্ষ ও পূর্ণতার সন্ধান করতেন তা'হলে এত সম্ভাবনাময় ও অর্থবহ একটি কাজ এত কম সমাদৃত হতো না। তবুও এ বইটি মেনার্ড কেইন্সের চিন্তার উৎসারণ ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল পথ নির্দেশ।

এ বইতেই মুদ্রা যে অর্থনীতির প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে সে তত্ত্বটিই প্রাথমিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এবং অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণে মুদ্রার এই কেন্দ্রিয় অবস্থান Economic Consequence of Peace থেকেই উপ্ত হয়ে কেইন্সীয় আলোচনায় প্রাধান্য লাভ করেছে। উপরন্তু সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে দেখা হয়েছে এবং ব্যক্তিক বা বেসরকারী মুনাফা সমস্ত অস্থিতির প্রতিকার হিসেবে ধরা পড়েছে। যদিও কেইন্স এ বইতে উইকসেলের স্বাভাবিক ও আর্থিক সুদের হারের

তারতম্য নিয়ে কথা বলেছেন, তবুও আর্থিক হার পরবর্তিতে General Theory-তে যে সুদের হারের উল্লেখ করেছেন তার সাথে সমার্থক নয় এবং স্বাভাবিক হার বা মুনাফা সম্পর্কে তিনি যে marginal efficiency of capital-এর আলোচনা করেছেন তার মধ্যেও একার্থক নয়। এ ছাড়াও তিনি প্রত্যাশাজনিত পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যেটি পরবর্তীতে ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতায় মুদ্রার চাহিদা সম্পর্কে তার মৌলিক মতবাদের অগ্রচিন্তা মাত্র।

তবুও Treatise of Money গ্রন্থ হিসাবে অপক্ক ও অসফল। সবাই কেইন্সের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করেছেন এবং হানসেন বা হায়েক যারা এর মূল সমীকরণ বা তাত্ত্বিক কাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারাও সশ্রদ্ধভাবেই তাদের আলোচনার উপস্থাপনা করেছেন। তবুও কেইন্স নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন যে তার প্রচেষ্টা পূর্ণসমাদর পায়নি এবং তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা পাঠকের কাছে পরিস্ফুট করে তুলতে পারেন নি। ঐ বইতে মূল্যসূচক, ব্যাংক রেট, ডিপোজিট তৈরী, স্বর্ণ সঞ্চয় ইত্যাদি সম্পর্কে যে আলোচনা আছে তাতে নতুন তত্ত্ব বা দৃষ্টি ভংগির তেমন পরিস্ফুট কোন পরিচয় নেই। কেইন্স চেয়েছিলেন নীতি নির্দ্ধারণে সহায়ক বিশ্লেষণের নতুন শৈলী সৃষ্টি করতে যেটা তার পূর্বসূরীদের থেকে ভিন্ন। কিন্তু যতবারই তিনি এ চেষ্টা করেছেন ততবারই ঐ শৈলী তাকে কাঙ্খিত ফল দেয়নি।

এ ব্যর্থতাই তাকে General Theory রচনায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তিনি তার সমস্ত প্রতিভাকে নিয়োজিত করেন এমন এক শৈলীর উদ্ভাবন করতে যা পূর্বসূরীদের থেকে ভিন্ন অথচ যা থেকে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ সম্ভব হয়ে উঠবে। এ জন্য তার প্রয়োজন হয়েছিল অর্থনৈতিক ধারণাগুলোকে নতুনভাবে বিচার করা। আর এ কাজে তার সহায়ক হয়েছিলেন একদল গুণগ্রাহী ছাত্র ও সহকর্মী যারা কিংস কলেজে কেইন্সের সান্নিধ্যে তার মতামত ও বিশ্লেষণ নিয়ে দিনের পর দিন উদ্দীপ্ত আলোচনা করেছেন।

Economic Consequence of the Peace-এ কেইন্স প্রথম যে অর্থনৈতিক বাস্তবতার কথা বলেছিলেন— যেখানে বিনিয়োগের সুযোগ কমে যায় অথচ সঞ্চয়ের স্বভাব থেকে যায়— সেটাই তিনি General Theory-তে পরিস্ফুট করলেন তিনটি concept-এর মাধ্যমে একটি হল ভোগ সম্পর্কে (consumption function), অন্যটি হল বিনিয়োগ সম্পর্কে (efficiency of capital funcition) এবং তৃতীয়টি হল মুদ্রার চাহিদা সম্পর্কে (liquidity preference function). এগুলোই স্থির মজুরী এবং স্থির মুদ্রা সরবরাহ সহযোগে আয় এবং শ্রমবিনিয়োগ (employment) নির্ধারণ করে; আয়ের সাথে শ্রম নিয়োগের সম্পর্ক একরৈখিক। এত অল্প তত্ত্ব নিয়ে এত বড় সমস্যা সমাধান সম্ভব হল কি করে ?

প্রথমতঃ কেইন্স সমষ্টিকৃত variable নিয়ে আলোচনা করেছেন। শ্রম নিয়োগ ছাড়া অন্য সমস্ত variable-ই অর্থমাত্রায় বিবেচিত। অর্থাৎ কেইন্স মূলতঃ মুদ্রাভিত্তিক বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দিয়েছেন, এবং জাতীয় আয় হল তার বিশ্লেষণের মূল কেন্দ্র। এদিক থেকে তার আলোচনার সাথে Quesnay এবং Cantillon-এর সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রক্রিয়ার বিবর্তনে যে সমস্ত জটিলতা দেখা দেয় কেইন্স তা এড়িয়ে গেছেন । তিনি 'স্থির' অবস্থার চিত্র একেছেন পরিবর্তনের মধ্যে না গিয়ে । যদিও তার লেখায় অনেক পরিবর্তনশীল factors ও Variable -এর পরিচয় মেলে ।

তৃতীয়তঃ কেইন্স তার 'মডেল' স্বল্পকালীন করে রেখেছেন । যদিও তার আলোচনায় দীর্ঘকালীন প্রেক্ষিত কখনও কখনও উপস্থাপিত হয়েছে । আর এই স্বল্পকালীনতার জন্য তার মডেলে উৎপাদন কার্য্য, উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সংখ্যা ও গুণ অপরিবর্তনীয় রাখা হয়েছে । ফলে অনেক সহজীকরণের পথ উন্মুক্ত হয়েছে যা অন্যথায় সম্ভব ছিল না, এরই ফলে শ্রমনিয়োগ আয়ের সাথে আনুপাতিক সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছে । ফলে কেইন্সের মডেল দীর্ঘকালীন প্রেক্ষিতে ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠে নাই । অবশ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে কেইন্স যে সময় General theory লিখছিলেন সেটি মহামন্দার কাল এবং ঐ রকম সময় উৎপাদন প্রক্রিয়া, শৈলী ও যন্ত্রপাতিকে অপরিবর্তনীয় বলে মনে করা যায় এবং ঐ সময় Liquidity preference তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে । সে কারণে হিকস কেইন্সার তত্ত্বকে মন্দানিতর অর্থনীতি বলেছেন । যদিও কেইন্সীয় তত্ত্ব সম্ভবতঃ অর্থনীতির স্থবিরতা থেকেই অধিকতর সমর্থন লাভ করে ।

চতুর্থতঃ কেইন্স আরও শ্রমনিয়োগের প্রত্যক্ষ নিয়ামকের বাইরে আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাননি অত্যন্ত সজ্ঞানভাবে । তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে এই প্রত্যক্ষ নিয়ামকগুলোরও বিচার বিশ্লেষণ সম্ভব যার ফলে এর পেছনে যে কারণগুলো রয়েছে সেগুলো অনুধাবন করা যায় । তবে কেইন্স এটা করেছিলেন মূলতঃ তার যুক্তিকে তীক্ষ্ণতায় তুলে ধরতে ।

পঞ্চমতঃ কেইন্স তার যুক্তিকে অনেক সময়ই অতিরঞ্জনের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন । এই অতিরঞ্জনের প্রয়োজন হয়েছিল অপ্রয়োজনীয় থেকে তার যুক্তি ধারাকে লক্ষণীয় করে তুলে ধরার জন্য । তা ছাড়া এই অতিরঞ্জনই হয় তো বা এত সহজে কেইন্সের মূল যুক্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ সম্ভব করেছে । অবশ্য অতিরঞ্জনের যে দিকটি অনেকেই মাত্রাধিক্য মনে করেন সেটি হল কেইন্সীয় তত্ত্বের General theory নামকরণ।

তা সত্ত্বেও এ কথা বলতেই হবে কেইন্স তার প্রয়োজনে যে সমস্ত ধারণার সমাহার ঘটিয়েছিলেন তার সবটাই তার তত্ত্বের জন্য প্রয়োজনীয় ও যথার্থ । এবং সেখানেই সম্ভবতঃ কেইন্সীয় চিন্তাধারার সামগ্রিক উৎকর্ষ । যুক্তি নির্ভর বই হিসেবে General Theory তাৎক্ষণিক সাফল্য লাভ করে । শুধু তাই নয় অর্থনীতিতে কেইন্সীয় স্কুল বলে এক দল অর্থনীতিবিদের আবির্ভাব ঘটে । যারা এই স্কুলে অন্তর্ভুক্ত নন, তাদের মধ্যেও অনেকেই সহজভাবে অথবা অনুপায় হয়ে বিশ্লেষণের জন্য কেইন্সীয় তত্ত্বের এক বা একাধিক ধারণা গ্রহণ করেছেন । তা ছাড়াও আছে অগণিত সহানুভূতিশীল অর্থনীতি গবেষক ও নীতি প্রণয়কারী যারা কেইন্সীয় তত্ত্ব পরিবর্ধন ও পরিমার্জনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন । লর্ড জন মেনার্ড কেইন্সের সাফল্য এখানেই ।

কেইন্সীয় অর্থনীতির কিছু আলোচনা

লর্ড কেইন্স নিঃসন্দেহে এ শতাব্দীর সব চেয়ে খ্যাতিমান ও বিতর্কিত অর্থনীতিবিদ । তিনি এ্যাডাম সিমথ, ডেভিড রিকার্ডো এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের মতই ক্ষুদ্র পরিসরে বিশেষজ্ঞ না হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়ে তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং বিভিন্ন ব্যাপারে নিজেকে ব্যাপৃত করেছেন । একদিকে যেমনি তার বিশেষ জ্ঞানের অভাব ছিল না, অন্যদিকে তিনি জ্ঞানের পরিধি টেনে নিজেকে ক্ষুদ্র পরিধিতে বিচ্ছিন্ন করতে চাননি । লর্ড কেইন্সকে বুঝতে হলে অন্য অর্থনীতিবিদ ও অন্য অর্থনীতি মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তার আলোচনা করতে হবে । আধুনিক অর্থনীতি অর্থাৎ শিল্পভিত্তিক ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ও বিশ্বব্যাপী বাজার-এর গোড়াপত্তন ঘটে সপ্তাদশ শতকে । তার পরবর্তী দেড়শ বছর ধরে ইংল্যাণ্ডেই আধুনিক অর্থনীতির তাত্ত্বিক অগ্রগতি ঘটেছে । এবং সে কারণে রিকার্ডো ও তার সমসাময়িক বৃটিশ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি পাশ্চাত্যে অবিসংবাদী সম্মান অর্জন করে এবং আধিপত্য বিস্তার করে । উনবিংশ শতকের শেষার্ধে ক্লাসিক্যাল ধারার সমন্বিত পরিচিতি বিনষ্ট হয় । আগে অর্থনীতির একটি ধারার নানা উপধারা সংযোজিত ও সমন্বিত হত, কিন্তু পরে দুটো পৃথক ধারার সৃষ্টি হয় তার একটি হল মার্কসবাদী এবং অন্যটি নিউ-ক্লাসিকাল । যদিও দুটি ধারাই ক্লাসিকাল অর্থনীতির উত্তরসূরী বলে দাবী করতে পারে, তবুও এদুটি ধারার মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিলনা বা গড়ে ওঠেনি । তার কারণ অবশ্য দুটি ধারা নিজের প্রয়োজনে ক্লাসিকাল অর্থনীতির বিভিন্ন তত্ত্ব গ্রহন বা বর্জন করেছে, পরিবর্তন বা পরিমার্জনা করেছে । তারাও কারণ হল মার্কসীয় অর্থনীতি উন্মুক্ত ভাবে এবং নিউ ক্লাসিকাল অর্থনীতি প্রচ্ছন্নভাবে দুটি বিরোধী ও বিবাদমান মতাদর্শের ভিত রচনা করেছে এবং আরও রয়েছে অন্য একটি ঐতিহাসিক কারণ, সেটি হল জাতীয়তার কারণে, মার্কসীয় অর্থনৈতিক মতবাদ বহুদিন ইংরেজী ভাষাভাষী বুদ্ধিজীবীদের মাঝে অর্থবহ কোন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি ।

যখন মেনার্ড কেইন্স বিংশ শতকের শুরুতে আলফ্রেড মার্শালের কাছে অর্থনীতির পাঠ নিতে শুরু করেন, তখন নিউ ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিই ইংরেজী ভাষাভাষী দেশে তার প্রভাব বিস্তৃত করেছে । মার্শাল তার প্রতিভার সাহায্যে গ্রহণযোগ্য সমস্ত তত্ত্বের একটি সার্বিক সমন্বয় সাধন করেছিলেন । এই সমন্বিত অর্থনীতির ধারাকেই কেইন্স গ্রহণ করেছিলেন । মার্শালও তার এই ছাত্রকে প্রতিভাধর উত্তরসূরী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন বলেই ট্রেজারী থেকে কিংস কলেজে তার প্রত্যাবর্তনকে তিনি সোৎসাহে স্বাগত জানিয়ে নিজের আয় থেকে অতিরিক্ত বার্ষিক ৯০০ পাউন্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন । মেনার্ড কেইন্স শিক্ষাগত দিক থেকে নিউ-ক্লাসিকাল অর্থনীতির ধারক ছিলেন ।

মেনার্ড কেইন্স এই নিউ-ক্লাসিকাল মতবাদের সংস্কারক মাত্র । আর এ সংস্কারের মূল লক্ষ্য হল অর্থনীতিকে বাস্তবতার মুখোমুখী নিয়ে আসা এবং একে রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নে অর্থবহ করে তোলা । এ কারণেই তিনি কখনই নিউ-ক্লাসিকাল অর্থনীতির গণ্ডি বা সীমাবদ্ধতা পার হতে পারেননি । এবং সে সীমাবদ্ধতার মূলে রয়েছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ছাড়াই অর্থনৈতিক জীবন ও প্রবাহকে স্বীকার করে নেয়া । এ কারণেই বলা হয়ে থাকে নিউ ক্লাসিকাল অর্থনীতি সামাজিক ক্রিয়াকর্মের বিশ্বস্ত দিকনির্দেশ দিতে ব্যর্থ হয় ।

মেনার্ড কেইন্সের General Theory শুরু হয় গোড়া অর্থনৈতিক মতবাদকে আক্রমণ করে এবং সমস্ত বইটি জুড়ে এ আক্রমণ অব্যাহত থাকে । এ আক্রমণের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল জে, বি, সের বাজারনীতি যার মূল কথা হল উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা কখনই কম হতে পারে না । এর প্রতিপক্ষে ক্ষীণ প্রতিবাদ সত্ত্বেও সমস্ত ক্লাসিকাল ও নিউ ক্লাসিকাল অর্থনীতি জুড়েই এই বাজার নীতি প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল । অর্থনীতিবিদদের আলোচনায় এর প্রভাব অর্থনীতিকে প্রায়ঃশই বাস্তবতাবর্জিত করে তুলেছে । মেনার্ড কেইন্স ক্লাসিকাল ও নিউ ক্লাসিকাল অনেক তত্ত্বেরই সমালোচনা করে অগ্রসর হয়েছেন, কিন্তু সমস্ত সমালোচনার কেন্দ্রে ছিল জে, বি, সের বাজারতত্ত্ব । ঐ বাজার তত্ত্ব গ্রহণ করলে কেইন্সের অন্য সমালোচনাও অসার হয়ে পড়ে । একবার এ বাজার তত্ত্ব অগ্রহণীয় বলে সিদ্ধান্ত করে তাকে সমস্ত ক্লাসিকাল ও নিউ ক্লাসিকাল তত্ত্বের আগাগোড়া খুঁজে বেড়াতে হয়েছে সে সমস্ত তত্ত্বের খোঁজে যেগুলো জে,বি, সের বাজার তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল আর যেগুলো তেমন নির্ভরশীল নয় । একথাই মেনার্ড কেইন্স তার General Theory -র ভূমিকায় ব্যাক্ত করেছেন এই বলে যে পুরানো ধারণা থেকে মুক্তিই কষ্টকর, নতুন ধারণা তেমন কষ্টকর নয় । মেনার্ড কেইন্সের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি সম্ভবতঃ সমস্ত পাশ্চাত্যের অর্থনীতিকে একটি পীড়াদায়ক সীমাবদ্ধকারী তত্ত্ব থেকে মুক্তি যার ফলে তার পরের অনেক অর্থনীতিবীদ নতুনভাবে অর্থনীতি নিয়ে চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন ।

একদিক থেকে বলা চলে যে কেইন্স গতানুগতিক অর্থনীতির সংকটকালে তার প্রতিভা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন মহামন্দার সময় যখন এই সংকট অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল । তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন যে জে,বি,সের বাজার তত্ত্বের অবশ্যসম্ভাব্যতা গ্রহণ করে মহামন্দার মত বাস্তবতাকে তাত্ত্বিক ভাবে অসম্ভব বিবেচনা করা হয়ে থাকে । এখান থেকেই তার ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সূতীক্ষ্ম বিশ্লেষণের সূচনা যার ফলে তিনি মন্দা, সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার, বেকারত্ব ইত্যাদির সম্ভাবনার বাস্তবতা তুলে ধরেন । তিনি ব্যক্তিস্বার্থ ও জনস্বার্থের দ্বন্দ্বও এরই সাহায্যে চিত্রিত করেন । উনবিংশ শতকের যে উদারনৈতিক তত্ত্ব যার ফলে বিশ্বাস জন্মেছিল যে ব্যক্তি স্বার্থের optimisation-এর মাঝেই জনস্বার্থ রক্ষিত হয়, সে উদারনৈতিক তত্ত্বকেই মেনার্ড কেইন্স অস্বীকার করলেন । কিন্তু কেইন্স ব্যক্তি ও জনস্বার্থের বৈষম্যকে সরকারের বদান্যতা বা বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সারিয়ে নিতে চাইলেন; তিনি ক্ষমতার বিন্যাস, শ্রেণীগত বৈষম্য বা সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলা থেকে বিরত থাকলেন । অর্থাৎ কেইন্স ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সামগ্রিক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি, তিনি ইতিহাসের বিচারে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দেখেননি, অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত অবস্থার সম্পর্কিত বিবেচনা করে দেখেননি । অর্থাৎ কেইন্স ধনতন্ত্রের সমস্যাকে অনুধাবন করেছিলেন আংশিকভাবে এবং তার সংস্কার মূলক সমাধানই তিনি আলোচনা করেছেন যেখানে ব্যক্তির সীমাবদ্ধতাকে সমষ্টি উত্তরণ করে সরকারী প্রচেষ্টার মাধ্যমে ।

এখানে স্মরণযোগ্য যে, মার্কস শুরু থেকেই জে,বি,সের বাজার তত্ত্বকে বাতিল বলে চিহ্নিত করেছিলেন এবং মার্কসের অনুসারীরা ১৯০০ সালের আগেই বিতর্কে নেমে

ছিলেন এই নিয়ে যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থায়ী ও chronic মন্দাবস্থায় পতিত হবে কিনা। কেইন্স উৎপাদন কৌশলে পরিবর্তন এবং সেই কারণে বেকারত্ব উপেক্ষা করেছেন, অন্যদিকে মার্কসীয় আলোচনায় সেটি প্রাধান্য পেয়েছে কারণ মার্কস মনে করতেন যে উৎপাদন কৌশলে পরিবর্তনের মধ্যদিয়েই ধনপতিরা শ্রমিকের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। মেনার্ড কেইন্স একচেটিয়া ব্যবসা, তার কারণে আয় বন্টনের বৈষম্য এবং উৎপাদনের উপাদান ব্যবহারের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেননি এবং এ কারণেই তিনি বলতে পেরেছিলেন যে এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে, বর্তমানে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উৎপাদনের উপাদানগুলোর অব্যবহার বা অপব্যবহার হচ্ছে যদিও তখন বেকারত্ব প্রকট হয়ে বিরাজমান ছিল। এ কারণেই কেইন্স রাষ্ট্রকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন সমস্যার সমাধানের সহায়ক হিসেবে যখন ধনতান্ত্রিক বাজার ব্যবস্থা অন্য কোন সমাধান দিতে অপারগ। কিন্তু কেইন্স রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র ও সে কারণে তার ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেননি। অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে কেইন্সের বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত অথবা মার্কসীয় অর্থনীতি সর্বত্র সর্বদা অভ্রান্ত। বরং একথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে কেইন্সীয় অর্থনীতির আলোকে মার্কসের Das capital -এর অসমাপ্ত খণ্ড, বিশেষ করে Theorien Uber den Mahrwert নতুনভাবে অর্থবহ হয়ে উঠে। কেইন্সীয় অর্থনীতির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অর্থনীতির বিশ্লেষণে এটি একটি ঐতিহাসিক দিক চিহ্ন, শুধু তাই নয়, কেইন্সের কারণেই সম্ভবতঃ মার্কসীয় ও নিউ ক্লাসিকাল অর্থনীতির মধ্যে আলোচনা ও বিতর্ক নতুন করে সম্ভব হয়েছে যার কিছু পরিচয় আমরা জোন রবিনসনের লেখায় পেয়ে থাকি।

মানুষ কেইন্স

জন মেনার্ড কেইন্স কেমন লোক ছিলেন ? যৌবনে রসিকতায় মোহনীয়, বুদ্ধিমত্তায় উদ্দীপ্ত, সহানুভূতিতে উদ্বেল, কর্মে নিবেদিত এবং স্বীয়দক্ষতায় বিশ্বাসীর দম্ভও তার ছিল। এ সমস্তই তার কাজে, কথায়, লেখায়, চিঠিপত্রে ফুটে উঠেছে। তার কর্মনিষ্ঠার একটা পরিচয় হল তার নিজের কথায় তিনি দিনে অন্ততঃ ১০০০ শব্দ লিখেছেন সে যুগে যখন টাইপ রাইটার, স্টেনোগ্রাফার, ডিক্টাফোন বা রেকর্ডার, ওয়ার্ড প্রসেসর কিছুরই চল ছিল না। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি গড়ে সপ্তাহে সংবাদপত্রের জন্য একটি নিবন্ধ লিখেছেন। এ ছাড়া ছিল তার শিক্ষকতা, সম্পাদনা কর্ম, বই লেখা, বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে তার মতামত জানানো এবং অন্যান্য শিল্প সাহিত্য ব্যবসা সম্পর্কীয় কাজ।

এতসব তিনি কখন করতেন ? তিনি সকালে ঘুম থেকে উঠেই বিছানায় নাস্তা করবার আগেই অনেক কাজ সেরে নিতেন। বিশেষ করে অর্থ সংক্রান্ত কাজগুলো তিনি সকালেই সারতেন, আর করতেন বাধাধরা দৈনন্দিন কাজগুলো। তিনি বেশ গোছালো ছিলেন বলেই তার কাজের সময়ে সাশ্রয় হত, হাতের কাছেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলো পেতেন। চিঠিপত্র লেখাও বিছানায় সারতেন, অশব্য প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন টাইপিষ্ট ব্যবহার করতেন তখন অফিসেও চিঠি লিখেছেন। পরে যখন অনেক চিঠি লিখতে হয়েছে কাজে, অনুরোধে, প্রতিক্রিয়ায় তখন অবশ্য সেক্রেটারীকে ডিক্টেশন দিয়েছেন।

তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের সাথে কথা বলতে অথবা ব্যবসার কাজ ছাড়া টেলিফোন ব্যবহার অপছন্দ করতেন এবং অচেনা অজানা লোকের টেলিফোনকে উৎপাত বলে মনে করতেন ।

মেনার্ড কেইন্স কাজ শুরু করেছিলেন ইণ্ডিয়া অফিসের সামরিক বিভাগে। তবে সে কাজে তার মন ছিল না এবং সময়ও তেমন লাগাতো না দৈনন্দিন কাজ শেষ করতে । সে সময়ই তিনি Probability-র উপরে তার গবেষণা সন্দর্ভ রচনায় নিরত হন । অবশ্য অবসরের এই সুযোগ শেষ হয়ে যায় রাজস্ব, পরিসংখ্যান ও বাণিজ্য বিভাগে বদলী হবার সাথে সাথে, এখানেই তিনি ভারতীয় মুদ্রা ও অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করেন । এবং এ ব্যাপারে তার অনুসন্ধিৎসা কেম্ব্রিজে ফিরে গিয়েও বর্তমান ছিল । ১৯১১ সালে তিনি এই কাজের ফলশ্রুতি স্বরূপ Recent Development of the Indian Currency System শীর্ষক দীর্ঘ নিবন্ধ রয়াল ইকনমিক সোসাইটিতে পাঠ করেন এবং পরবর্তীতে এটিই তার Indian Currency and Finance বইতে রূপান্তরিত হয় ।

ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে জটিল ছিল এবং সময়ের অতিবাহনে এটি জটিলতর হয়ে উঠে । মেনার্ড কেইন্স-এর লেখা থেকে তার এ জটিল পদ্ধতির অনায়াস জ্ঞান ও বিশ্লেষণ পাঠককে আকৃষ্ট করে । সে আলোচনার কোন তথ্যের অবহেলা সেই । কোন বিষয়ের সহজীকরণ নেই, অথচ সমস্ত বিষয়টি বোধগম্য ও সহজপাঠ্য হিসেবে উপস্থিত হয়েছে; একারণেই তিনি ১৯১৩-১৪ সালে Royal Commission on Indian and Finance -এর কনিষ্ঠতম সদস্য হন । কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা তার চেয়ে বয়োজেষ্ঠ্য ছিলেন, অনেকেই ব্যক্তি অথবা অর্থ সংক্রান্ত সংস্থায় কাজ করেছেন এবং বৃটিশ ভারতে দীর্ঘদিন অবস্থান করেছেন । তবুও কমিশনারের সামনে উপস্থাপিত মতামত, স্বাক্ষ্য, আলোচনা এবং রিপোর্টের মুসাবিদা থেকে সহজেই অনুমেয় যে একমাত্র মেনার্ড কেইন্স এবং সম্ভবতঃ লাওনেল আব্রাহামস (ICS) ছাড়া আর কেউ জটীল মুদ্রা ব্যবস্থা ও তার ভারতীয় জটিলতা তেমন বুঝতে পারতেন না ।

মেনার্ড কেইন্স অতি সহজে বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন দিকের সামান্যতম বিষয়ও পর্যালোচনা করতে পারতেন । এ কারণে একমাসের মধ্যে মোটামুটি এককভাবে কাজ করে তিনি বৃটিশ ভারতের জন্য দীর্ঘ ৬০ পৃষ্ঠার একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন । আলফ্রেড মার্শাল, যিনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তখন একজন নন্দিত ব্যক্তিত্ব এবং মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কে তারও গবেষণা প্রসূত লেখা ছিল, মেনার্ড কেইন্সের ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কিত মতামত ও বিশ্লেষণ দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন তরুণ অর্থনীতিবিদেরা যদি এমন সুন্দর ও সহজভাবে অল্পপরিসরে জটিল ব্যাপার ব্যাখ্যা দিতে গ্রহণযোগ্য করে তুলে ধরতে পারে তবে বয়স্ক অর্থনীতিবিদদের বিদায় নেবার সময় প্রত্যাসন্ন হয়েছে । একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে একমাত্র মেনার্ড কেইন্সের প্রতিভাই রয়েল কমিশনের সদস্যদের অপরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা ও পরস্পরবিরোধী মতামত থেকে ঐ রিপোর্টকে রক্ষা করেছিল । এটি তিনি করেছিলেন তার যুক্তি নির্ভর মনের সাহায্যে, যদিও তিনি কেবল কয়েকটি শব্দের পরিবর্তন করতেন মাত্র তবুও তারই মাধ্যমে তিনি নীতিগত পরিবর্তন ও সামঞ্জস্য সাধন করেছেন অতি সহজে । এখানে তার ইংরেজী ভাষাজ্ঞান যথার্থই সাহায্য করেছে ।

১৯১৫ সালে তিনি ট্রেজারীতে চাকুরী নিলেন, তখন বিভিন্ন বিষয়ের খুটিনাটি সম্পর্কিত জ্ঞান ও আগ্রহ তাকে প্রভূত সাহায্য করেছিল । ট্রেজারী তখন জনাকীর্ণ ছিল না, বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরিচালিত । প্রতিদিন মেনার্ড কেইন্সকে নতুন তথ্য পরিচ্ছন্ন ভাবে বুঝাতে হত এবং অনেক নতুন ব্যাপারে তাকে বিশ্লেষণ বা নির্দেশনামা লিখতে হত । ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বরে তার বাবাকে লেখা এক চিঠি থেকে জানা যায় যে, তিনি সে সপ্তাহে তিনটি বিশ্লেষণমূলক দলিল (memoranda) লিখেছেন যার একটি মন্ত্রী পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে । এ ছাড়াও প্রায় একডজন কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মেমোরাণ্ডা লিখেছেন; এ ছাড়াও করেছেন বাজেটের কাজ, রুটিন কাজ এবং Economic Journal সম্পাদনার কাজ । একজন সাধারণ মানুষ এই তালিকা দেখে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় হতবাকই হতে পারে । মেনার্ড কেইন্সের পরে যারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলে ট্রেজারীতে কাজ করেছেন তারা জানান কেইন্সের মেমোরাণ্ডা কেবলমাত্র একজন স্থায়ী যুগ্ম সচিবের ন্যূনতম শাব্দিক পরিবর্তনের পর অর্থমন্ত্রীর কাছে সরাসরী উপস্থাপিত হয়েছে এবং অর্থ মন্ত্রীও বিশেষ কোন পরিবর্তন না করে এগুলোকেই সরকারী দলিলের মর্যাদা দিয়েছেন । পয়ত্রিশ বছর বয়স্ক একজন মানুষের জন্য এ ছিল এক অকল্পনীয় মর্যাদা ।

মেনার্ড কেইন্স প্যারীস শান্তি আলোচনায় গিয়েছিলেন ট্রেজারীর পক্ষ থেকে প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে, তিনি আলোচনা চলাকালেই মত পার্থক্যের জন্য পদত্যাগ করেন । ফলে তিনি সরকারী কর্মচারী না থেকে একজন বিদগ্ধ সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন । এ ভূমিকায় যেমনি বেসরকারী লোকের স্বাধীনতা ছিল, তেমনি ছিল সরকারী পদ্ধতি ও চিন্তার অভ্যন্তরীণ জ্ঞান । প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও শান্তি আলোচনাকে নিয়েই তিনি The Economic Consequences of the Peace বইটি লেখেন । বইটি ছাপা হয়েছিল ১৯১৯ সালের ১২ই ডিসেম্বরে এবং অতিদ্রুত বইটি বিক্রি হয়ে যায় । বইটিতে মেনার্ড কেইন্সের আন্তরিক অনুভূতি বিমূর্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু তথ্য বা বিশ্লেষণকে অস্বীকার করে নয় । তিনি এ বইতে মিত্রদেশের মধ্যকার ঋণ মওকুফ ও ইউরোপের পুণর্নির্মাণ সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য রাখেন । তার মত লয়েড জর্জ সমর্থন করেছিলেন কিন্তু প্রেসিডেন্ট উইলসন তা প্রত্যাখ্যান করেন । তিনি জার্মানীর ক্ষতিপূরণ দেয়ার ক্ষমতা সম্পর্কেও তথ্যবহুল আলোচনা করেন যার ফলে পোলিশ সরকার ক্ষুব্ধ হন ।

ট্রেজারীর অভিজ্ঞতা এবং প্যারিস আলোচনা মেনার্ড কেইন্সের ভূমিকায় গুণগত প্রভাব ফেলে । মেনার্ড কেইনন্স পরবর্তী জীবনে তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদ হয়েও, রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক প্রশ্ন ও নীতিমালার প্রতি আকৃষ্ট হন । তিনি এক অর্থে সাংবাদিক ও প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং একই সাথে সংবাদপত্র ও একাডেমিক পত্রিকায় নিবন্ধের পর নিবন্ধ লিখে মানবিকতা, নমনীয়তা, যুক্তি নির্ভরতাকে তুলে ধরেছেন । মেনার্ড কেইন্সের পত্রাবলী থেকে দেখা যায় তার লেখার কারণে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ভার্সাই চুক্তির ফলশ্রুতিতে যে সমস্ত আন্তর্জাতিক মতদ্বৈধতা দেখা দিয়েছিল বৃটিশ সরকার সে সমস্ত ব্যাপারে পরিশেষে অনেক নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন । এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯২২ সালে তারই সম্পাদনায় Manchester Guardian পত্রিকা Reconstruction of Europe শিরনামে ১২টি খণ্ডে ৭৮২ পৃষ্ঠায় সে

সময়কার বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে খোলামনে আলোচনা প্রকাশ করেন । তিনি এ ব্যাপারে যে সমস্ত মনীষার মতামত একত্রিত করেছিলেন তার মধ্যে ছিলেন গোর্কি, ক্রোচে, কার্ল মেলকিওর, এসকুইথ, লর্ড সেসিল প্রমুখ। তিনি এই বিশাল প্রকাশনার সমস্ত বিষয়ে গভীর আগ্রহ সহকারে সময় দিয়েছেন । তিনি নিজে ১৪টি নিবন্ধ লিখেছিলেন । যদিও বৃটিশ সরকার তার মতামতকে উগ্রপন্থী মনে করেছিলেন তবুও বৈদেশিক মুদ্রায় আগাম বাজার সম্পর্কে তার সুপারিশকে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে জেনোয়া সম্মেলনে উত্থাপন করা হয়েছিল ।

যখন মেনার্ড কেইন্স এমন ব্যস্ত, Nation পত্রিকার জন্য প্রতি সপ্তাহে লিখছেন, তখনই তিনি তার অর্থনীতির তাত্ত্বিক বইগুলোও রচনা করেছেন । ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানের জন্য লিখতে লিখতে রচনা করেছেন A Tract on Monetory Roform. আর এ সময় কেম্ব্রিজে পড়াতে পড়াতে A Treatise on Money এবং The General Theory of Employment, Interest and Money লিখেছেন । এখানে তাড়া নেই, এখানে তাত্ত্বিক নিরীক্ষা অনেক গভীর, এখানে যুক্তির আবহ অনেক উৎকীর্ণ । তাই পড়িয়েছেন, আলোচনা করেছেন, তর্কে নেমেছেন, যুক্তি খুঁজেছেনে । তার সহায়ক ছিলেন একদল তরুন ছাত্র আর শিক্ষক । এ বই দুটি লিখতে প্রচুর সময় লেগেছে । Treatise লিখেছেন ছ'বছর ধরে, ১৯২৪ থেকে ৩০ । লেখার সময় ও লেখার শেষে পিয়েরো শ্রাফা, রিচার্ড কান, জেনস মিড, জোন রবিনশন ও অষ্টিন রবিনশন মেনার্ড কেইন্সের সাথে আলোচনায় নিরত হয়েছেন । এরা সবাই পরে স্বনাম খ্যাত অর্থনীতিবীদ ও অর্থনীতির শিক্ষক হয়েছেন । Treatise বেরুবার পর ঐ বইটিই একটি কোর্সে কেইন্স পড়িয়েছেন । কেইন্স নিজে Treatise নিয়ে তুষ্ট ছিলেন না, শেষ হয়েও যেন শেষ হল না এমন একটা অসন্তুষ্টিতে তিনি ভুগছিলেন । এই আলোচনা ও অসন্তুষ্টি থেকেই উদ্ভূত হয় General Theory. তখন থেকেই মেনার্ড কেইন্স General Thoery-র উপর কাজ শুরু করেছেন, মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছেন, যুক্তি নির্ভরতা খুঁজেছেন; এবং আগে যে বিশ্লেষণ করেছেন তার উন্নয়ন সন্ধান করেছেন । ১৯৩৪ সালেই তিনি তার লেখা প্রাথমিকভাবে শেষ করে General Theory পড়াতে শুরু করেন । তার সে লেখার উপরে যারা ক্রমাগত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা হলেন রিচার্ড কান, জোন রবিনশন, রয় হ্যারড ও র‍্যালফ হটরে । ফলে General Theory -র বেশ পরিবর্তন সাধিত হয় । (এ সম্পর্কে উল্লেখ্য যে ডেনিস রবার্টশন General Theory-র মতাদর্শকে সমর্থন করেননি ।)

মেনার্ড কেইন্সের বিশাল ব্যক্তিত্বের মধ্যে যৌবনের তাৎক্ষণিকতা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, ছিল সংবেদনশীল হৃদয়ের মহানুভবতা । সমাজের অসুবিধাগ্রস্থদের প্রতি তার একটা তাত্ত্বিক টান ছিল । তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রদের জন্য সংখ্যা নির্ধারণের বিরোধীতা করেছেন, মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার এবং অন্যত্র সমানধিকারের সমর্থক ছিলেন, তিনি যুদ্ধবিরোধী বিবেকের তাড়নায় যারা সৈনিক হতে অস্বীকার করেছে তাদের পক্ষ নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন এই বলে যে, সামরিক কার্যে নিয়োজিত হওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে নিজের মতামতের স্বাধীনতা বিলিয়ে দিতে তিনি রাজী নন ।

তিনি কখনই তার মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারকে খর্ব হতে দেননি । সে কারণেই তিনি নাটকীয়ভাবে আদর্শগত কারণে প্যারীস শান্তি সম্মেলন থেকে ট্রেজারীর প্রধান প্রতিনিধির পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন । তিনি যথার্থ ও ন্যায়সংগত সমাধান খুঁজেছিলেন,পরাজিত শক্তিকে দোহন করে বিজয়ী শক্তিকে আর্থিক সমস্যার সমাধান তার কাম্য ছিল না । তিনি ডক্টর মেলকিওর-এর কাছ থেকে জার্মানীর প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা ও শক্তি বুঝবার চেষ্টা করেছেন অত্যন্ত আগ্রহ ও সহানুভূতির সাথে।

মেনার্ড কেইন্স এক অর্থে সুবিধাবাদী ছিলেন, তিনি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পিছ পা হননি এবং শুরুতে পিতৃ-মাতৃ সম্পর্কে পরিচিত উচ্চ পদস্থদের ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগও রয়েছে (যেমন অষ্টিন চেম্বারলীন বা এশকুইথ)। ট্রেজারীতে তার নিরলস কর্ম একদিকে তার নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে অন্যদিকে তার মতামতকে প্রতিষ্ঠা করতে সুযোগ করে দিয়েছে এবং তিনি একাজ অত্যন্ত সজ্ঞানতার সাথে সুযোগ্যতার ভিত্তিতে সদম্ভে করেছেন বলে অনেকের বিশ্বাস। তার প্রাথমিক সাফল্য তাকে দর্পী করে তুলেছিল । তিনি চটপট কাজ করতেন । তিনি অশান্ত এবং অসহনশীলও হতে পারতেন । যেহেতু তিনি অতি সহজে অনেক জটিল ব্যাপার হৃদয়ংগম করতে পারতেন, সেহেতু যারা ধীরে কাজ করে তাদের প্রতি তার সহানুভূতি ছিল কম । তার এই বুদ্ধিমত্তা ও অসহনশীলতা তাকে এক রকম বিচ্ছিন্নতা এনে দিয়েছিল । কেম্ব্রিজ-লণ্ডন-সাসেক্স ছিল তার পৃথিবী । ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থায় তার আগ্রহ ও জ্ঞান থাকা সত্বেও তিনি ভারতবর্ষে যেতে অস্বীকার করে কমিশন থেকে পদত্যাগ করেন । যদিও ছুটি কাটাতে বিত্তশালী বৃটিশদের মত ইউরোপ এমনকি মরোক্কো ও মিশরে তিনি গিয়েছিলেন । তবুও কাজের জন্য কেম্ব্রিজ-লণ্ডন-সাসেক্স-এর বাইরে যেতে চাননি । কেবল মাত্র জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দীর্ঘদিন আমেরিকায় তাকে কাটাতে হয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে নতুন আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থার সন্ধানে । তার বিচ্ছিন্নতার আরেকটি দিক ছিল তার উচ্চবিত্তের জীবন ধারা । তিনি শ্রমিক শ্রেণীর জীবনের মান উন্নীত করতে চেয়েছেন কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর জীবন সম্পর্কে তার কোন পরিচ্ছন্ন ধারণাই ছিল না ।

কেইন্সের রচনাশৈলী

এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, অর্থনীতিবিদের লেখা কি রচনাশৈলীর কারণে বিচার্য; অবশ্য একথা শাস্ত্র নির্বিশেষে বলা হয়ে থাকে যে, রুচীই মানুষের পরিচয় আর রচনাশৈলী রুচীর পরিচায়ক । কেইন্স সম্পর্কে একথা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা যায় যে, লেখার মাঝের তার মৌল মনোভংগি, তার বৈশিষ্ট্য ও তার স্বভাব পরিস্ফুট হয়ে ধরা পড়েছে ।

অর্থনীতি শাস্ত্রে অপরিচ্ছন্ন, অসুন্দর এবং সাধারণ লেখার কমতি নেই । বেশীর ভাগ অর্থনীতিবিদদের লেখাই সহজপাঠ্য নয় এবং সেগুলোতে কাঙ্খিত সাবশীলতা থাকে না । কেইন্সের সব লেখাও এক পর্যায়ের নয় । তবুও The Economic Consequences of the Peace কিংবা Eassys in Persuation অথবা Eassys in Biography আকর্ষণীয় পাঠ । তার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তার জীবন স্মৃতি (Two Memoirs) সাহিত্যিক কেইন্সের অপূর্ব পরিচয় বহন করে । অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে এ বইগুলো

কেইন্স সাধারণ পাঠকের জন্য লিখেছিলেন এবং অনেক লেখার মধ্য থেকে বাছাই করে গ্রন্থিত করেছেন । এখন অনেকেরই মনে পড়বে না যে, কেইন্স তিন শতাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং এর অনেকগুলোই সাধারণ পাঠকের জন্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ।

রচনাশৈলীর আলোচনায়, একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, তিনি সাংবাদিকতা ও সম্পাদনায় দক্ষ ও নিবেদিত ছিলেন । তিনি বর্তমানের জন্য লিখেছেন, বর্তমান সমস্যা নিয়ে লিখেছেন, অনেক সময় তাৎক্ষণিক সমাধান বা পরিকল্পনা তুলে ধরেছেন । কেইন্স দ্রুত লিখতেন, তার দুর্বোধ্য হাতের লেখায় কমই কাটাকাটি বা পরিবর্তন করতেন ; যখন তিনি আবেগে নিন্দামন্দ করতেন, তখনই কেবল তার লেখায় পরিবর্তন তিনি করেছেন । তিনি পরিশ্রমী ছিলেন এবং লেখা তার সহজেই আসত: নিজেকে লেখায় প্রকাশ করতে তার অসুবিধা ছিল না । পরিচ্ছন্ন ঝরঝরে চিন্তা তার লেখাকেও পরিচ্ছন্নতা দান করেছিল । তার লেখার আরেকটি দিক ছিল তার চিন্তার ক্রমাগত বিকাশ এবং তার চিন্তার অভিযোজন । কেইন্স ছিলেন যোদ্ধা, তিনি তার মতবাদকে যুক্তির সাথে সজোরে উত্থাপন করতেন । তিনি প্রচারকও ছিলেন সে অর্থে আর তার শিক্ষকতার রেশ তার লেখায়ও গিয়ে পড়েছে । তার নীতিবোধজাত ঘৃণা ও সংস্কারের উৎসাহ যেমনি তাকে সাংবাদিক করেছে তেমনি তার পারদর্শিতা তাকে লেখার নিয়ত রেখেছে । তিনি তাকে এমন এক বুদ্ধিজীবী মনে করতেন যার কাজ হচ্ছে উদ্বুদ্ধ করা, কাঙ্খিত কর্মে প্ররোচিত করা । তিনি ছিলেন স্বভাব সম্মোহনকারী, এমনকি প্রলুব্ধকারী । তিনি শব্দের ইন্দ্রজাল রচনা করতে পারতেন, আর শব্দগুলো যুক্তির সূত্রে গ্রন্থিত হয়ে কখন আবেগ কখন অনুভুতি সহজে গ্রহণীয় করে উপস্থাপিত করত । শব্দই ছিল তার বীনা, আর শিল্পীর মত তিনি তার ব্যবহার করেছেন । সেজন্য তার লেখা সজ্ঞান আর শব্দের ব্যবহার তার শক্তি ও নৈপুণ্যের পরিচায়ক । তিনি শব্দের সঠিক অর্থ জানতেন আর শব্দের ব্যবহারেই তিনি তার রসবোধ, কল্পনা এমনকি যুক্তির ঝোক সুন্দর করে তুলে ধরতেন ।

নৈপুণ্য এসে ছিল কালক্রমে কিন্তু সজ্ঞানতা তার চিরকালের সম্পদ । সিভিল সার্ভিসে কাজ করবার সময় তিনি যে মেমোরাণ্ডা তৈরী করতেন তাতে বিবেচনাগুলো কিভাবে বিন্যস্ত করা ভাল সে সম্পর্কে তিনি ভাল প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন, এজন্য বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন এবং নিজের যুক্তির আলোচনা সহজ যুক্তিযুক্ত ও সাধারণ জ্ঞানের মতই মনে হয় । সাধারণের জন্য লেখায় জটিল কোন বিষয় তুলে ধরতে হলে কেইন্স পরিচিত রূপকের সাহায্যে নিয়েছেন । কেইন্সের লেখার ধরন অনেক সময় পাঠকের সাথে কথপোকপনের মত ছিল, প্রশ্ন করা ও তার উত্তর খুঁজে বের করা এবং এমন একটা আলাপ চারিতায় সেটা পূর্ণ হত যে অনেক সময় মনেই থাকে না যে, এটা একপক্ষীয় কথাবার্তা ।

তার লেখায় অনেক সময় ভার্জিনিয়া উলফ (যিনি ব্লুমসবেরী ক্লাবের সদস্য ছিলেন) এর মত এক লাইনে একজন জীবন্ত মানুষের চারিত্রকে চিত্রন করতে পারতেন । লয়েড জর্জ ও উড্রু উইলনের চরিত্র স্মরণ করা যেতে পারে । এমনকি আলফ্রেড মার্শাল সম্পর্কে তার স্মৃতিকথাও স্মরণীয় । তার কল্পনাও অনেক সময় বল্গাহীন হতে

পারত । যেমন রাশিয়ার কম্যুনিষ্টদের তিনি আটিলার নেতৃত্বে প্রথম যুগের খৃস্টান বলে বর্ণনা করেছিলেন । তার মৌলিক রসালাপ অনেক সময় বিদ্রূপের মত শোনাত । অসম্ভবের জ্ঞান তাকে ব্যংগ সম্পর্কে সচেতনতা দিয়েছিল আর তার লেখায় এই ব্যাংগ কায়িক রূপ পরিগ্রহ করত (যেমন আমেরিকানরা বিশ্বের স্বর্ণসম্ভারে হোচট খেয়ে পড়ে আকাশমুখী স্বর্ণবাছুর তৈরী করছে)। স্তুতিচ্ছলে নিন্দাও তার লেখায় প্রচুর পাওয়া যায় । (যেমন তিনি বলেছেন ইউরোপীয় অধমর্নের ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা আমেরিকানরা সদয়ভাবে গ্রহন করে তাদেরকে ক্ষমা দিয়ে অভিভূত করে দেয়)।

কেইন্সের সংবাদপত্রের জন্য প্রথম লেখাগুলো অত্যন্ত কার্যকর, বাহুল্যবর্জিত ও স্থিতধী । তবে পরবর্তীকালে তার লেখায় দ্রুততাজনিত অসাবধানতা, কিছু অতিরঞ্জন, কিছু আনাড়িসুলভ শৈলী পরিলক্ষিত হয়েছে । কিন্তু তার লেখার পরিমাণ লক্ষ্য করলে, এটা অবশ্য তেমন উল্লেখ্য নয় ।

তার লেখার উপস্থাপনায় দু'টি জিনিসের সংমিশ্রণ ছিল । প্রথমেই তিনি উদ্‌ঘাটিত গোপন তথ্যের সংক্ষিপ্ত সার দিতেন যেখানে অমংগলের পূর্ব সূচনা চিহ্নিত হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ বাণীও লিপিবদ্ধ হয়েছে, এর পরে থাকত ইতিহাসের আলোচনা যেটি তার অন্তর্দৃষ্টিতে উজ্জল হয়ে উঠত । দ্বিতীয় যে জিনিস তিনি তুলে ধরতেন সেটি একপ্রস্ত পরিসংখ্যান, সহজে যাদের বিশ্বাস হয় না তাদের জন্য । এই দুই জিনিসের মিশ্রণ কেবল যে কার্যকরী ছিল তা নয় বরং সেটা আকর্ষনীয়ও ছিল ।

এতসব সত্বেও কেইন্স অনেক অর্থনীতিবিদদের হতবুদ্ধি করেছেন তার রচনা দিয়ে । শব্দের নতুন যোজনায়; কোন কোন অর্থনীতিবিদকে তিনি হতবাক ও হতদৃষ্টিও করে ফেলেছেন । এজন্য এ.সি. পিগু তার বিরুদ্ধে সহমতের চাইতে ভিন্ন মতকে তুলে ধরে কুজ্ঝটিকা সৃষ্টির অভিযোগ এনেছেন । কেউ বা বলেছেন তিনি কেবল শব্দাধুনীক মাত্র । তবুও একথা সত্য যে, জন মেনার্ড কেইন্স তার লেখায় নতুন তত্ত্বের স্বচ্ছ যোজনা করেছেন আর পুরাতন তত্ত্বের যৌক্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন ।